করেছেন।

১০.৫ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রপ্রবণতা (Centralising Tendencies in Indian Federalism)

ভারতীয় সংবিধান প্রণেতাগণ ও শাসককুল ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে জোরালো দাবি করলেও একটি গভীরভাবে বিশ্লেষণে কিন্তু ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অস্বাভাবিক কেন্দ্রপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এর নানা নজির রয়েছে। সংক্ষেপে এই কেন্দ্রপ্রবণতার কয়েকটি দিক তুলে ধরা হল—

প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে ক্ষমতা বণ্টনের রূপরেখা পর্যালোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। আমরা সকলেই জানি যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের দুটি স্বীকৃত পদ্ধতি আছে। একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদলে (US Model) তথা রাজ্যের হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা এবং সংবিধানে নির্দিষ্ট ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ ; আর দ্বিতীয়টি হল কানাডা ধাঁচের (Candian Model) তথা কেন্দ্রের হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা এবং সংবিধানে নির্দিষ্ট ক্ষমতাগুলি রাজ্যের হস্তে সমর্পণ। এছাড়া যুগ্ম ক্ষমতা উভয় মডেলেই দেখতে পাওয়া যায়।

ক্ষমতা বণ্টন ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

ভারতের উপরে বর্ণিত ক্ষমতা বণ্টন পদ্ধতির কোনো একটিকে এককভাবে বেছে নেয়নি। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের লক্ষ্যে তিনটি তালিকা যথা—(ক) কেন্দ্রীয় তালিকা—৯৮টি বিষয়, (খ) রাজ্য তালিকা—বর্তমানে ৫৯টি বিষয় এবং (গ) যুগ্ম তালিকা— বর্তমানে ৫২টি বিষয়-এ বিভাজন করা হয়েছে। বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে আইন প্রণয়নের অধিকারী হল কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ; রাজ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে আইন প্রণয়নের অধিকারী হল রাজ্য আইনসভা এবং যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে আইন প্রণয়নের অধিকারী হল কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ও রাজ্য আইনসভা উভয়েই। সাধারণভাবে ক্ষমতা বণ্টনের এই নীতি যুক্তরাষ্ট্রের দ্যোতক। কিন্তু এই ক্ষমতা বণ্টনের মধ্যে কতকগুলি ইঙ্গিত আছে যা কেন্দ্রপ্রবণতাকে প্রকট করে। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়, প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয় ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ক. আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রপ্রবণতা

(১) তিনটি তালিকায় বর্ণিত ক্ষমতাগুলি কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে বণ্টিত হলে অবশিষ্ট ক্ষমতা (residual power) কেন্দ্রের উপরে ন্যস্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলি অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

(২) যুগ্ম তালিকায় যে বিষয়গুলি রয়েছে সেসব বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই আইন প্রণয়ন করতে পারে; কিন্তু রাজ্য আইনসভা প্রণীত কোনো আইন কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত আইনের বিরুদ্ধে গেলে তা বাতিল হয়ে যায়।

(৩) রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির অন্যান্য ক্ষমতাকে স্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে রাজ্য স্ব স্ব রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকারী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়েও কেন্দ্রীয় আইনসভা আইন প্রণয়নের অধিকারী এবং তা-ই কেন্দ্রপ্রবণতার লক্ষণকে প্রকট করে।

প্রথমত, রাজ্যসভা উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে (২৪৯ ধারা অনুসারে) যদি এই মর্মে প্রস্তাব পাস করে যে, জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা তথা পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন করা উচিত তা হলে ঐ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র আইন প্রণয়ন করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই 'জাতীয় স্বার্থ' বিচার করার ক্ষমতা শুধুমাত্র 'রাজ্যসভায়' ন্যস্ত এবং এই আইন রচিত হলে তা ১ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে ; তবে পুনরায় ঐ একই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হলে ঐ আইন আরও ১ বছর করে বলবৎ থাকতে পারে।

জাতীয় স্বার্থ

দ্বিতীয়ত, ভারতে জাতীয় জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকলে (৩৫২ নম্বর ধারা অনুসারে) সংসদ সমগ্র ভারত বা তার যে-কোনো অংশের জন্য রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে (২৫০ ধারা অনুসারে)। অনুরূপভাবে, রাজ্যে জরুরি অবস্থা বলবৎ তথা রাষ্ট্রপতির শাসন থাকলে ৩৭৫ ধারা অনুসারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জন্য সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে।

জাতীয় জরুরি অবস্থা

তৃতীয়ত, ২৫২ ধারা অনুসারে দুই বা ততোধিক রাজ্য যদি রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য সংসদকে অনুরোধ জানায় তাহলে সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে। কিন্তু এই আইন শুধুমাত্র সেই সমস্ত আবেদনকারী রাজ্যে বলবৎ হয়, অন্য রাজ্যে বলবৎ হয় না। অবশ্য অন্য রাজ্য ইচ্ছা করলে এই আইন গ্রহণ করতে পারবে।

দুই বা ততোধিক রাজ্যের আবেদন

চতুর্থত, ২৫৩ ধারা অনুসারে আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সন্ধি বলবৎ করার প্রয়োজনে সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

আন্তর্জাতিক চুক্তি

পঞ্চমত, ২৪৬ ধারা অনুসারে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্র তালিকা ও যুগ্ম তালিকায় প্রণীত আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের সময় কেন্দ্রীয় ও যুগ্ম তালিকায় প্রণীত আইনকে মাথায় রেখে আইন প্রণয়ন করতে হয়। কেন্দ্রীয় আইনের প্রাধান্য সর্বময়।

ষষ্ঠত, রাজ্যপালের মাধ্যমে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও কেন্দ্র হস্তক্ষেপ

করতে পারে। সংবিধানের ২০০ ও ২০১ ধারা অনুসারে কোনো বিল রাজ্য আইনসভা কর্তৃক পাস হবার পর আইনে পরিণত হবার জন্য রাজ্যপালের কাছে স্বাক্ষরের জন্য প্রেরিত হয়। রাজ্যপাল উক্ত বিলে স্বাক্ষর না দিয়ে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারেন। যতদিন না রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাচ্ছে, ততদিন ঐ বিল আইনে পরিণত হয় না।

রাজ্যপাল

পরিশেষে ৩৫৬ ধারা অনুসারে রাজ্যে জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকলে রাজ্যের যাবতীয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভায় নস্ত হয়।

খ. শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রপ্রবণতা

ভারতে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ক ক্ষমতা পর্যালোচনা করলে এ ক্ষেত্রেও এককেন্দ্রিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যকে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অধীনে থেকে কর্মসম্পাদন করতে হয় বলে বহু ভারত বিশেষজ্ঞের মতে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। একে একে এই বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত হল ঃ

প্রথমত, প্রতিটি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হলেন রাজ্যপাল। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নন। ভারত সংবিধানের ১৫৫ ধারা অনুসারে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত এবং ১৫৬ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর তাঁর কার্যকালের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সুতরাং রাজ্যপাল হলেন রাষ্ট্রপতি তথা কেন্দ্রের প্রতিভূ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাই রাজ্যপালের নিয়োগ ও অপসারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে রাজ্যপাল কোনোদিন স্বাধীনভাবে অথবা রাজ্যের স্বার্থভিত্তিক স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এমনকি নিয়মতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নিলেও সমস্যার মুখোমুখি পদে সমাসীন করায় (২০০১) কেন্দ্রের বিরাগভাজন হন।

কেন্দ্রের প্রতিভূ হিসাবে রাজ্যপাল

দ্বিতীয়ত, ২৫৬ ও ২৫৭ ধারা অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের সঙ্গে সামাঞ্জস্য বিধান করে চলতে হয়। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় আইন মোতাবেক এজন্য রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে।

রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। যদি কোনো রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অমান্য করে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে ধরে নিয়ে ৩৫৬ ধারার প্রয়োগ ঘটাতে পারে। জে. সি. জোহরি তাই বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার অনিচ্ছুক রাজ্যগুলিকে শাস্তি দানের অধিকারী।" বস্তুত পৃথিবীর কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারকে নির্দেশদানের এমত ক্ষমতা দেখা যায় না।

নির্দেশদান ক্ষমতা

তৃতীয়ত, ২৫৭ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় অথবা প্রতিরক্ষার কারণে গুরুত্বপূর্ণ রাজপথ, রেলপথ, জলপথ ও অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে এবং রাজ্য সরকারগুলি সে নির্দেশ পালনে বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ পানাগড় সামরিক কেন্দ্র থেকে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম সামরিক কেন্দ্র পর্যন্ত যেদিন বা যে সময়ে সামরিক যান চলাচলের জন্য প্রয়োজন সে সময় অসামরিক যান চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারে।

প্রতিরক্ষা

২৫৮ ধারা

চতুর্থত, ২৫৮ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোনো রাজ্য সরকারি কর্মচারীকে কেন্দ্রীয় কাজে নিযুক্ত (requisition) করতে পারে।

সরাসরি আইনগত, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও এককেন্দ্রিক প্রবণতার আরও কয়েকটি ক্ষেত্র রয়েছে। সেগুলি হল ঃ

১. বিচারব্যবস্থায় এককেন্দ্রিকতা ঃ পৃথিবীর অধিকাংশ যুক্তরাষ্ট্রে দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় সেখানে সমান্তরাল বিচারব্যবস্থা বিদ্যমান তথা অঙ্গ রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আদালত ব্যবস্থা থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের আদালতগুলি এক্ষেত্রে পথিকৃৎ। অপরদিকে ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলিতে হাইকোর্ট আছে কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়। দ্বিতীয়ত, হাইকোর্টগুলিকে সুপ্রিমকোর্টের অধীনে থেকে বিচারকার্য সম্পাদন করতে হয়। তৃতীয়ত, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত ও স্থানান্তরিত হন। একারণেই মরিস জোনস অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপক প্রাধান্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

বিচারব্যবস্থা

২. রাজ্যের আয়তন ও অবস্থিতি ঃ ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে পার্লামেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যে-কোনো অঙ্গরাজ্যের নাম, সীমানা, আয়তন ইত্যাদির পরিবর্তন করতে পারে। তবে এ ধরনের কোনো বিল উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রয়োজন। পার্লামেন্ট উত্থাপিত বিল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে এ বিষয়ে মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ দেওয়া হয়; তবে ঐ মতামত গ্রহণ করতে পার্লামেন্ট বাধ্য নয়। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরামর্শই শেষ কথা। সুতরাং "অভঙ্গনীয় রাজ্য সমন্বয়ে গঠিত অভঙ্গনীয় কেন্দ্র" নীতি ভারতে মানা যায় না। বস্তুত ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন আইন প্রণয়ন করে অতি সহজেই রাজ্যের ভৌগেলিক মানচিত্র পরিবর্তিত হয়েছিল। এছাড়া, পার্লামেন্ট আইন করে রাজ্যের সম্মতি ছাড়া কোনো অঙ্গরাজ্যের যে-কোনো এলাকা বিদেশি রাষ্ট্রকে অর্পণ করতে পারে। অঙ্গরাজ্যের অস্তিত্ব কেন্দ্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরে অনেকটাই যে নির্ভরশীল তার নজিরও আছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের বেরুবাড়ি এলাকা পাকিস্তানকে অর্পণ করে। তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্র আইন করে এই হস্তান্তর বলবৎ করে। বিষয়টি সুপ্রিমকোর্টে উত্থাপিত হলে সুপ্রিমকোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত তথা পার্লামেন্ট প্রণীত আইন বৈধ বলে স্বীকার করে নেয়।

রাজ্যের অস্তিত্ব

৩. যুক্তরাষ্ট্রে "রাজ্য সমতা" (State equality) ঃ এই নীতি সর্বজনস্বীকৃত। এই নীতি অনুসারে আয়তন, জনসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামরিকগত অবস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজ্যে রাজ্যে পার্থক্য থাকলেও প্রতিটি রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে সমানাধিকার ভোগ করে তদনুসারে প্রতিটি রাজ্য দ্বিতীয় কক্ষে সমসংখ্যক সদস্য প্রেরণের অধিকারী হয়। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্য সিনেটে সমসংখ্যক সদস্য তথা দু'জন করে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। টেক্সাসের প্রতিনিধি ও আলবামার প্রতিনিধি সমান। ভারতে এই নীতি অস্বীকৃত। কেন্দ্রীয় আইন ভারতে উচ্চকক্ষে অর্থাৎ রাজ্যসভায় বিভিন্ন রাজ্য থেকে বিভিন্ন সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ স্থির করে দেয়। তদনুসারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৬ জন সদস্য ও সিকিম রাজ্য থেকে ১ জন সদস্য রাজ্যসভায় প্রেরিত হয়ে থাকে।

রাজ্য সমতা

৪. যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যগুলির বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার ঃ পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য থেকে সরে যাওয়ার ভয় কেন্দ্রের থাকে। ভারতীয় সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলিকে এই অধিকার না দেওয়ার জন্য অনেকেই ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলতে অস্বীকৃতি জানায়।

বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার

৫. **অঙ্গরাজ্যের সংবিধান ঃ** প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নিজ নিজ সংবিধান থাকা যুক্তরাষ্ট্রীয় রেওয়াজ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান আছে। এই সংবিধানগুলি লিখিত থাকায় রাজ্যের এক্তিয়ার সুনির্দিষ্ট থাকে এবং তদনুসারে স্বাধীনভাবে রাজ্যগুলি স্ব স্ব ক্ষেত্রে কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারে। ভারতে এই নীতি মানা হয়নি। তাই সারা দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রবর্তিত হয়েছে। শুধু জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য একটি পৃথক সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছিল, তাও ভারতীয় মূল সংবিধানের সঙ্গে যুক্ত (৩৭০ ধারা) ছিল।

অঙ্গরাজ্যের সংবিধান

৬. **একনাগরিকত্ব ঃ** ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দ্বি-নাগরিকত্ব নেই। ভারতে নাগরিকত্ব নির্ধারণ করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে ন্যস্ত। সংবিধানের ৫ নম্বর ধারা অনুসারে সংসদ এ বিষয়ে যাবতীয় আইন প্রণয়নের অধিকারী। ফলে রাজ্যগুলি এ ব্যাপারে করণীয় কিছুই থাকে না। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষমতা রাজ্যের হাতেই ন্যস্ত থাকে। প্রায় সর্বত্র চালু আছে দ্বি-নাগরিকত্ব ব্যবস্থা। অর্থাৎ প্রথমে ব্যক্তিকে কোনো রাজ্যের নাগরিক হতে হয়, তবে সে জাতীয় নাগরিকত্ব লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ প্রথমে কোনো ব্যক্তি ভার্জিনিয়া রাজ্যের নাগরিক হলে তবেই সে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করে। ভারত যুক্তরাষ্ট্র দ্বি-নাগরিকত্ব ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে কেন্দ্রীয় প্রবণতাকে প্রসারিত করেছে।

এক নাগরিকত্ব

৭. **কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন কমিশন ঃ** ভারতে অর্থ কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, নির্বাচন কমিশন, নদী কমিশন ইত্যাদি হল কেন্দ্রীয় হাতিয়ার যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে বা কেন্দ্রের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করে। উদাহরণস্বরূপ সংসদ, রাজ্য আইনসভা, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ইত্যাদি নির্বাচন করার দায়িত্ব হল নির্বাচন কমিশনের। এই নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারের কর্মীবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপত্র পান। ফলে নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব সহজেই প্রকট হয়। টি. এন. শেষনের বেশ কিছু অগণতান্ত্রিক ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিরূপ মন্তব্য করলেও তাঁকেই সব অঙ্গরাজ্যকে মেনে নিতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে পরিকল্পনা কমিশন সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় প্রবণতার অন্যতম নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যায়। কারণ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতি এবং এই কমিশনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ। রাজ্যগুলির কোনো প্রতিনিধি এই কমিশনে থাকে না; অথচ এঁরাই সারা দেশে আর্থিক ভবিষ্যৎ নির্বাচনের ক্ষেত্রে চরম কর্তৃত্ব ভোগ করে থাকেন।

কমিশনসমূহ

৮. **উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগে কেন্দ্রিকতা ঃ** রাজ্য প্রশাসনে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগেও কেন্দ্রীয় প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আই. এ. এস., আই. পি. এস., আই. এফ. এস. প্রভৃতি সর্বভারতীয় কর্মচারীদের নিয়োগের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের হাতে ন্যস্ত। এঁরা রাজ্য প্রশাসনে নিয়োগ পেলেও এঁদের চাকুরির শর্তগুলি স্থির করে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে রাজ্য সরকার অপেক্ষা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি এঁদের আনুগত্য ও আস্থা অধিক। কেন্দ্রীয় সরকারও এই সুযোগে এঁদের মাধ্যমে রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে থাকে। নিঃসন্দেহে এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির পরিপন্থী।

উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ

৯. **ভারতীয় দল ব্যবস্থা ঃ** পরিশেষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যে দল ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতেও

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রে যে দল শাসন করে সাধারণভাবে রাজ্যেও সেই দল ক্ষমতায় আসীন থাকে। ফলে কেন্দ্রীয় নির্দেশ রাজ্যের দলীয় নেতৃত্বকে মেনে নিতে হয়। এটাও ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণ বা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধী। উপরে বর্ণিত কেন্দ্রীয় প্রবণতাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শাসনব্যবস্থাকে যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা বলে অভিহিত করাই শ্রেয় বলে অনেকে মনে করেন। অধ্যাপক কে. সি. হোয়ার ভারতকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেছেন। মরিস জোনস, জি. অস্টিন প্রমুখ তাত্ত্বিকেরা ভারতকে 'সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্র' (Co-operative Federalism) বলে চিহ্নিত করেন। অবশ্য ড. বি. আর. আম্বেদকর ভারতীয় শাসনব্যবস্থাকে শান্তির সময় যুক্তরাষ্ট্র ও জরুরি অবস্থার সময় এককেন্দ্রিক বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এই বক্তব্য যথাযথ নয়। তাই কে. এম. মুন্সী বলেন "ভারতকে খুব বেশি হলে আধা-যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করা যায়; কারণ এই ব্যবস্থাকে প্রয়োজনবোধে এককেন্দ্রিক সংবিধানে পরিণত করা যায়।"

দল ব্যবস্থা

কিন্তু আমরা সকলেই একটি কথা স্বীকার করব যে, বর্তমান পৃথিবীর প্রতিটি যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিক যুদ্ধের ভীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, পারমাণবিক শক্তির বিকাশ, পরিবহন ব্যবস্থার প্রসার, পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি এবং দৈত্যকায় রাজনৈতিক দলের উদ্ভব সর্বত্রই কেন্দ্রীয় সরকারকে অধিক শক্তিশালী করে তুলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ওয়াশিংটন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান হিসাবে যে ক্ষমতা ভোগ করেছেন তা থেকে রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা আজ (২০০৯) অনেক বেশি শক্তিধর। সেখানেও কেন্দ্রের হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। সুতরাং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া সত্ত্বেও যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সুইজারল্যান্ড বা কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়, তাহলে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে অভিহিত করায় কোনো অস্বাভাবিকতা থাকে না।

উপসংহার

১০.৬ ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক (Centre-State Relations in India)